সুলতানী যুগে যে সামাজিক কাঠামো দেখা যায় মুঘল যুগে তা প্রায় অপরিবর্তনশীল ছিল। এর মধ্যে অবশ্য পুরানো ধারার চলার ছন্দ যেমন পাওয়া যায় তেমনি নূতন ধারা শুরুর ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। যেটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সেটা হল গ্রামাঞ্চলে সামাজিক কাঠামো আরো শক্ত হয়ে আসে, তার শ্রেণীবিভাজন পরিষ্কারভাবে দেখা যায়। এরসঙ্গে শুরু হয়ে যায় নগরায়ণ, কারিগরদের সংখ্যা বৃদ্ধি, একটা মিশ্র শাসকশ্রেণীর গড়ে ওঠা যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমলাতন্ত্রের প্রসার। এর সঙ্গে দেখা যায় মধ্যবর্তীশ্রেণীর বিস্তার ও বণিকশ্রেণীর প্রসার। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষে ভারতের জনসংখ্যা কত ছিল পরিষ্কার করে বলা যায় না। ইরফান হাবিব ও শিরিণ মুসভী খাজানার পরিমাণ, জমা ইত্যাদি সম্পর্কে আবুল ফজল যে তথ্য দিয়েছেন তার থেকে মুঘল ভারতের লোকসংখ্যা ধরেছেন ১৪ থেকে ১৫ কোটির মধ্যে। এটা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে বেড়ে দাঁড়ায় ২০ কোটির কাছে।

ষষ্ঠদশ ও সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে বলা যায় যে শতকরা ৮৫ ভাগ লোক গ্রামাঞ্চলে থাকত। কিন্তু সমকালীন সাহিত্যে ও বিদেশী পর্যটকদের লেখা থেকে গ্রামের অবস্থা খুব কমই জানা যায়। চৈতন্যের সমকালীন বাংলার গ্রামাঞ্চল থেকে যে ছবি সমকালীন বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে একটি গ্রামের থেকে অপর একটি গ্রামের মধ্যে প্রচুর ফাঁকা জায়গা রয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে মোদাভ স্থলপথে পাটনা থেকে আগ্রা যাবার সময়ে একই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু গ্রাম্যজীবন কিরকম ছিল তার কথা বলেন নি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কোন কোন ইংরাজ লেখক পাঞ্জাবে গ্রামপঞ্চায়েতের কথা ও জমির মালিকানা সদস্যদের মধ্যে কয়েক বছরে ঘোরানোর কথা বলে এই গ্রামগুলিকে শান্ত ও ছোট 'রিপাব্লিক' বলে অভিহিত করেছেন। *গুরু গ্রন্থ সাহেবের* থেকে আলোচনা করে ইরফান হাবিব দেখাচ্ছেন যে ওখানে জমির মালিক ও ভূমিহীন কৃষকের কি ধরনের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল পেশাগত গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে। এই গ্রামগুলিকে কোন মতেই শান্ত, ক্ষুদ্র 'রিপাব্লিক' বলে ধরা যায় না। সাম্প্রতিককালে মারাঠী, রাজস্থানী ও ফার্সী দলিল থেকে গ্রাম্যজীবনের ছবি বেশি পাওয়া যায়।

উপজাতিদের বাদ দিলে গ্রামাঞ্চলের যে বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে সেটি হচ্ছে ওখানকার সমাজের শ্রেণীবিভাজন। তাছাড়াও আরো নানান ধরনের বিভাজন পাওয়া যায়। লোকদের থাকার অবস্থা, জাতিভেদ ও কাজের জন্য পদমর্যাদার উপর ভিত্তি করে বিভাজন ছিল। সতীশ চন্দ্র মনে করছেন যে গ্রাম সমাজে তার অবস্থা বোঝানোর জন্য লোকেদের পার্থিব অবস্থা বড় কোন উপাদান হিসাবে ছিল না।

Scanned with CamScanner

বলাবাহুল্য গ্রামের জনসংখ্যার অধিকাংশই ছিল কৃষক যাদের মধ্যে বড় একটা অংশ দাবি করত যে তারা গ্রামের আদি অধিবাসীদের বংশধর। কৃষকদের মধ্যে দুটো ভাগ দেখা যায়—*রিয়াতি* ও *রায়তি*, অর্থাৎ যাদের নানারকম অধিকার রয়েছে এবং যাদের ঐ অধিকার নেই। *রিয়াতি* ছিল কৃষক অধিবাসী যারা জমির মালিক। মহারাষ্ট্রে এদের বলা হত *মিরাসী* এবং রাজস্থানে বলা হত *ঘারু-হালা*। ফার্সীতে এদের বলা হত *খুদ-কাস্ত*। অষ্টাদশ শতাব্দীর একটা পুঁথিতে বলা হচ্ছে যে যারা গরু ইত্যাদি টাকা দিয়ে কিনে অন্যদের দিয়ে চাষ করায়, তারাই *খুদ-কাস্ত*। অন্যভাবে বলা হচ্ছে যে জমির মালিক যদি নিজের জমি চাষ করে, তাহলে সে *খুদ-কাস্ত*। এরা ভূমি-রাজস্ব দিত কম হারে এবং কতকগুলি কর থেকে, যেমন বিবাহের, ছাড় দেওয়া হত। গ্রামে যদি তার একটা বাসা থাকে তাহলে তাকে কোন বাড়ির কর দিতে হত না। ইংরাজ রাজপুরুষরা লক্ষ্য করেছেন যে অর্থনৈতিকভাবে *খুদ-কাস্ত* সুবিধা পেত ঠিকই, কিন্তু তার বড় সুবিধা হল সামাজিক মর্যাদা বেড়ে যাওয়া। এদের আরো কতকগুলি সুবিধা দেওয়া ছিল যার মধ্যে ছিল গ্রামে উঁচু পদ পাওয়া, জঙ্গল ও জলাধারের ব্যবহার করার সুবিধা এবং গ্রামের আমলাদের কাছ থেকে কাজ পাওয়া। এরাই ছিল গ্রামের পঞ্চায়েতের শাসকবর্গের মধ্যে অন্যতম।

উঁচু জাতের লোকেরা, যেমন ব্রাহ্মণ, রাজপুত, মহাজন ও বানিয়া ছিল *রিয়াতির* মধ্যে এবং তারাও নানারকম সুবিধা পেত। এছাড়াও ছিল গ্রামের আমলারা, যেমন প্যাটেল, চৌধুরী, কানুনগো, পাটওয়ারী ইত্যাদি যারা সম্ভবত *খুদ-কাস্ত* এবং এই সুবিধাগুলি পেত।

ভারতের বিভিন্ন জায়গায় *রিয়াতিদের* আলাদা *দস্তুর* বা করের নিয়মাবলী ছিল। রাজস্থানী নথী থেকে জানা যায় যে এরা উৎপাদনের এক-চতুর্থাংশ কর দিত যেখানে সাধারণ নিয়ম ছিল এক-চতুর্থাংশ থেকে অর্ধেক পর্যন্ত। জাতের ভয়ে ব্রাহ্মণরা নিজের হাল ধরতেন না, তারা ভাড়া করা লোক দিয়ে তাদের জমি চাষ করাতেন। তবে কখনো কখনো অন্যান্যদেরও করের ছাড় দেওয়া হত। সাধারণত *খুদ-কাস্তদের* ধরে নেওয়া হত গ্রামের সব কৃষক অধিবাসীদের। বাইরের গ্রাম বা পরগণা থেকে কৃষকরা উদ্বৃত্ত জমি চাষ করতে আসত যাদেরকে *পাহী-কাস্ত* বলা হত। অনেক সময়ে তারা ছেড়ে যাওয়া গ্রামে বা নূতন গ্রামে বসতি করত। বহু জায়গাতেই ওদেরকে কম কর ধরে পাট্টা দিয়ে দেওয়া হয়েছিল যেটা আমরা ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষের দিকে লেখা কবি মুকুন্দরামের নগর বসানোর সময়ে পাই। ওখানে অবশ্য মুকুন্দরাম বলছেন যে তিন বছর কোন কর দিতে হবে না, যে প্রথা নূতন পত্তনীর সঙ্গে প্রচলিত বলে ধরা যেতে পারে। পুরো কর ঐ ক্ষেত্রে সাধারণত তৃতীয় বা পঞ্চম বর্ষে নেওয়া হত। অনাবৃষ্টির ফলে গ্রাম পরিত্যক্ত হলে কিছুদিন পর আবার পুরানো মোড়লকে ডেকে ঐ গ্রামেই নূতন পত্তনী বসানোর কথা পাওয়া যায়। ওখানে মোড়লের কাছ থেকে মুচলেকা নেওয়া হয় যে সবটা জমিতে চাষ-আবাদ করা হবে। মহারাষ্ট্রের এরকম একটা গ্রামের কথা পাওয়া যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। মুচলেকা নেওয়ার পর ওকে পাট্টা দেওয়া হয়। এবং ঐ বছরের জন্য উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ কর বলে নেওয়া হয়। যেহেতু *পাহী-কাস্তদের* হাল, লাঙল, গরু ইত্যাদি নেই, সেক্ষেত্রে

Scanned with CamScanner

অনেক সময়েই এগুলি হয় সরকার দেয় না হলে গ্রামের মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে করা হয়। টাকাও দেওয়া হয়। মুকুন্দরামের লেখায় এসবের উল্লেখ রয়েছে। যতদিন তারা ভূমি-রাজস্ব দিচ্ছে, ততদিন জমি তাদের দখলে থাকে।

নানা কারণে কৃষকরা এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে চলে যায় যার মধ্যে অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষই ছিল প্রধান। কিন্তু স্থানীয় কর্মকর্তাদের অত্যাচারে কৃষককে গ্রাম ছাড়া হতে হত যার বর্ণনা মুকুন্দরামের লেখার মধ্যে আছে। ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে কবি তুলসীদাস এর উল্লেখ করেছেন। সুতরাং গ্রাম্যসমাজ অচঞ্চল হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল না যদিও গ্রামাঞ্চলের সামাজিক কাঠামো এতে বদলায়নি। রাজনৈতিক অশান্তির সময় *পাহী-কাস্থদের* সংখ্যা বেড়ে যায়, যা অষ্টাদশ শতাব্দীতে দেখা যায়। কখনো কখনো দলিতদের মধ্যে থেকে *পাহী-কাস্থ* করা হত কারণ তারা যে জমিতে চাষ করছে তার দখল রাখতে চাইত। *পাহী-কাস্থকে* সুতরাং সাময়িক কৃষক বা ভ্রাম্যমাণ কৃষক বলা যাবে না। কয়েক বংশ ধরে জমি চাষ করে তারা কৃষক অধিবাসীদের সমতুল্য হয়ে যায় যা আমরা ১৭৭০ সালের বাংলায় মন্বন্তরের পরে দেখেছি।

রাজস্থানের সাধারণ কৃষকদের *রায়তি* বা *পালটি* বলা হত। ফার্সীতে ওদের বলা হত *মুজারিয়ান*। পালটিরা সাধারণত ছিল মধ্যবর্তী জাতের জাট, গুজর, মালি, আহির ইত্যাদি। তারা যে জমি চাষ করছে তার মালিক হতে পারে অথবা ভাড়াটেও হতে পারে। ওদেরকে রায়তি আইন অনুযায়ী কর দিতে বলা হত। এই করের হার বদলাতো ফসলের উপর ও ঋতুর উপর নির্ভর করে। সেটের জলও পাওয়া যাচ্ছে কিনা সেটাও বিচার করা হত। সাধারণত *পোলাজ* জমির উপর কর নেওয়া হত উৎপাদনের অর্ধেক। গম ও বাজরার উপর $\frac{১}{৫}$ অংশ কর ধরা হত অন্যান্য কর ছাড়া। *পাহী-কাস্থদের* দুভাগে ভাগ করা যায়। একদল ছিল যারা *খালিসা* জমিতে চাষ করত যেগুলি ছিল অনুর্বর বা অনেক সময়েই পরিত্যক্ত। ওদের নিজেদের গবাদি পশু ও হাল ছিল। ওদেরকে একবছর বা একটা ফসলের জন্য পাট্টা দেওয়া হত। দ্বিতীয় ভাগে ছিল সেই সব কৃষক যারা জমিদারদের ব্যক্তিগত জমিতে চাষ করত। তাছাড়াও তারা ভূমিয়া, প্যাটেলেদের জমিতে বা ইনাম জমিতে চাষ করত। অনেক সময়েই এরা মহাজন, জমিদার ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল ছিল গরু, মোষ, বীজ ইত্যাদির জন্য। তারা ভূমি-রাজস্ব ছাড়াও মালিকদের ভাড়া দিত অথবা ফসল-ভাগ করার বাজারে কাজ করত। অনেক সময়ে এদেরকে *পালটি* বলা হত এবং এরা এক গ্রাম থেকে অন্যগ্রামে ঘুরে বেড়াত বেশি টাকা পাবার জন্য বা ভূমি-রাজস্বে প্রচুর ছাড় পাবার জন্য।

এছাড়া ছিল ভূমিহীন মজুর। এরা বিভিন্ন পেশা যেমন ছুতোর, নৌ-বহর ইত্যাদিতে নিযুক্ত ছিল। মহারাষ্ট্রে এধরনের পেশা ছিল বারো জনের, যাদেরকে *বালুতেদার* বলা হত। এরা গ্রামের উৎপাদন থেকে একটা নির্দিষ্ট ভাগ (*বালুত*) পেত। এই ধরনের আর একদল ছিল যাদেরকে *আলুতেদার* বলা হত, তারা সব গ্রামে ছিল না এবং সংখ্যাতেও বেশি ছিল না। এরা হচ্ছে সুপারী বিক্রেতা, স্বর্ণকার ইত্যাদি। এরা গ্রামের উৎপাদনের অল্প ভাগ পেত

Scanned with CamScanner

বা অনেক সময়ে এক ফালি জমি পেত। এদেরকে বলা হত *কারিন* এবং এদের মধ্যে দলিত অনেক ছিল।

রিয়াতি, *রায়তি* ও পেশাগত লোকেদের তুলনামূলক হার গ্রামে কত ছিল বলা শক্ত। পূর্ব রাজস্থানের অষ্টাদশ শতাব্দীর একটা গ্রামে যে হিসাব পাওয়া যাচ্ছে তার থেকে দেখা যায় যে *রিয়াতি* শ্রেণীর সংখ্যা ছিল প্রায় শতকরা ১৩। পেশাগত লোকেদের হার ছিল এগার ও *রায়তির* ছিল বাকী ৭৬ শতাংশ। গ্রামীণ সমাজে যে বিরাট বৈষম্য ছিল তা এর থেকে পরিষ্কার। ১৬৬৬ সালের পূর্ব রাজস্থানের আর একটা নথী থেকে জানা যায় যে ৮৬ জন কৃষকের মধ্যে ৯ জনের ছিল প্রত্যেকের চাষযোগ্য ১২৬ বিঘা, ২৩ জন চাষীর ছিল ৭০ বিঘা এবং ৫০ জন চাষীর প্রত্যেকের ছিল ৩০ বিঘা করে জমি। এই ধরনের বৈষম্য অন্যান্য পরগণাতেও দেখা যায়। এর থেকে বোঝা যায় যে সাধারণ মাপের একটা গ্রামে শতকরা পাঁচজন মত কৃষক ছিল যাদের অবস্থা ছিল স্বচ্ছল এবং তাদেরকে মধ্যবর্তী শ্রেণীর মধ্যে ফেলা যায়। তাছাড়া ছিল শতকরা ১৫ থেকে ২০ জন যাদের কৃষিকার্য নিজেদের খরচে করার অবস্থা ছিল না। এদেরকে গরীব কৃষক বলাই সঙ্গত। এদের মধ্যে হীন কৃষকদের ধরা হয়নি।

এসব থেকে বলা যায় না যে দারিদ্র্য বাড়ছিল কিনা বা ধনীরা আরো ধনী হয়ে যাচ্ছিল কিনা। সাধারণভাবে বলা যায় যে স্থানীয় বা কেন্দ্রীয় প্রশাসন দুর্বল হয়ে পড়লে ধনী অংশটা করের বোঝা গরীব কৃষকদের উপরে চাপিয়ে দেয়। এটাও জানা দরকার এই বৈষম্য গ্রামের মধ্যে কি ধরনের প্রভাব ফেলেছিল। এর বোধহয় ভালোমন্দ দুই দিকই আছে। খারাপ দিকটা হচ্ছে যে ধনী অংশটি টাকা বা অন্যান্য দ্রব্য দিয়ে ঋণ দিত এবং ফসল হলে সুদ শুদ্ধ আদায় করে নিত। অনেক সময়ে কৃষকদের ঋণের অভাবে জমি চলে যেত। দুর্ভিক্ষের সময়ে এই ধরনের ঘটনা বেশি দেখা যেত, যখন কৃষকরা তাদের জমি ছেড়ে চলে গিয়েছে। সরকার বিশেষ মাথা ঘামাত না। তারা শুধু দেখত যে জমির অবস্থা এমন যেন না হয় যাতে খাজানা ছাড় দিয়ে হয়। ভালো দিক হচ্ছে যে গ্রামের জমিদার ও স্বচ্ছল কৃষকরা অর্থ, বীজ, গরু ইত্যাদি ধার দিয়ে চাষ-আবাদ শুরু করিয়েছে যার ফলে কৃষিকার্যের প্রসার হচ্ছে, বিশেষত উচ্চমানের ফসলে যেমন গম বা বাজারী ফসলে অর্থাৎ নীল, তৈল বীজ ইত্যাদি। নূতন ফসলে যেমন তামাক, ভুট্টা ইত্যাদিতে লগ্নী হয়েছে। এগুলিতে জল ও মজুর বেশি লাগে।

সুতরাং মুঘল যুগে বৈষম্য ও উন্নতি পাশাপাশি চলতে থাকে। কিন্তু শান্তি ও শৃঙ্খলার অভাব হলে এই ধারা রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে যার ফলে গরীব কৃষকদের উপরে চাপ বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

গ্রামীণ সম্প্রদায়

গ্রাম বলতেই একটা স্থানীয় সম্প্রদায় বোঝায়, যার মধ্যে আমরা দেখেছি নানারকম বৈষম্য রয়েছে। পঞ্চায়েত নিয়ন্ত্রণ করত হয় মধ্যবর্তী কৃষক অধিবাসীরা, না হলে কয়েকজন ধনী

Scanned with CamScanner

কৃষকরা। গ্রামীণ সম্প্রদায় গ্রামে কোন জমির মালিক ছিল না। এগুলি ছিল বিভিন্ন ব্যক্তির হাতে যারা ভূমি-রাজস্ব আলাদা হারে দিত। অনেক সময়ে অবশ্য কৃষক অধিবাসীরা সমষ্টিগত ভাবে ভূমি-রাজস্ব দিত যাতে কৃষকরা জমি পরিত্যাগ করে চলে না যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে জমিদাররা শক্তিশালী হয়ে গেলে কৃষক অধিবাসীরা দুর্বল হয়ে পড়ে।

কারিগর

মুঘল যুগে দক্ষ ও অদক্ষ কারিগরদের সংখ্যা ছিল বিশাল। বাবর বলছেন আগ্রাতে তাঁর বাড়িগুলিতে কাজ করার জন্য প্রতিদিন ৬৮০ জন কারিগর কাজ করত। আগ্রা, ফতেপুরসিক্রী, বিয়ানা ও ঢোলপুরে ১৪৯১ জন পাথর কাটার কারিগর কাজ করত। আগ্রা দুর্গ তৈরি করার জন্য আকবরের সময়ে তিন থেকে চার হাজার কারিগর ও আমলা কাজ করেছে। এছাড়া চুন ও পাথর জোগান দেবার জন্য আরো আট হাজার লোক নিযুক্ত ছিল। ফরাসী পর্যটক তাভারনিয়ার বলেছেন যে বিশ হাজার লোক একনাগাড়ে কাজ করেছে তাজমহল তৈরি করার জন্য। এছাড়াও বিভিন্ন অভিজাতদের বড় বড় বাড়ি, বিভিন্ন শহরে রাজপ্রাসাদ, প্রদেশের রাজধানীগুলিতে দুর্গ-প্রাসাদ করার জন্য অসংখ্য লোকের প্রয়োজন হত। তাছাড়া ছিল বিভিন্ন শহরে নানারকম কারিগরী শিল্প তৈরি করার জন্য অসংখ্য কারিগর, যাদের সংখ্যা বের করা সম্ভব নয়। এদের মধ্যে অবশ্য দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক দুইই ছিল। এদের অধিকাংশই ছিল জাত-ভিত্তিক ও উত্তরাধিকারসূত্রে কাজ করছে যে কথা বার্নিয়ার ও অন্যান্য কয়েকজন পর্যটক বলে গিয়েছেন। তবে চাহিদা বাড়লে কারিগরদের সংখ্যা যে বেড়ে যেত তাতে সন্দেহ নেই।

সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ইউরোপীয় কোম্পানীগুলির ক্রমবর্ধমান চাহিদার ফলে কাপড়ের শিল্পের উৎপাদন দ্রুত বাড়তে থাকে। বাংলা, করমণ্ডল ও গুজরাট এই শিল্পে বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। তাঁতের কাপড় ছাড়া এর সঙ্গে রেশম লাগিয়ে ও রং করে কাপড় তৈরি হবার ফলে শিল্পের মধ্যে বিশেষত্ব কারিগরদের আবির্ভাব হতে থাকে। বিভিন্ন ধরনের তাঁতের কাপড়, যার মধ্যে মসলিনের সূক্ষ্ম কাপড় ছিল, যা ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হতে থাকে। আমরা আগেই দেখেছি যে ইউরোপীয় চাহিদার ফলে প্রচুর সংখ্যায় কারিগরের প্রয়োজন হচ্ছে যদিও সংখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে। এছাড়া ছিল ছুতোরের কাজ যেটা জাহাজ ও নৌকা নির্মাণ ও সারানোর কাজে লাগত। চামড়ার কাজের চাহিদা ছিল যার সঙ্গে ধাতুর কাজ, কাগজ তৈরি ও কাঁচের কাজের কথা পাওয়া যায়।

এটা সাধারণত বলা হয় যে ভারতীয় কারিগররা সাধারণ যন্ত্রপাতি নিয়ে উচ্চমানের শিল্প তৈরি করতে পারতেন। একটা কারণ হয়ত ছিল যে কারিগরদের হাতে তেমন উদ্বৃত্ত অর্থ থাকত না যা দিয়ে তারা নূতন যন্ত্র বের করতে পারে যেখানে মানুষের শ্রম কমবে।

Scanned with CamScanner

আভ্যন্তরীণ বাজার এত বড় ছিল না যে পুনঃপুন উৎপাদনের যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। তাছাড়া ঐ ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করতে গেলে যে ধরনের শক্তি প্রয়োগ করার প্রয়োজন হবে সেটাও কারিগরের কাছে ছিল দুর্লভ। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইউরোপীয় পাদ্রীরা যখন ছাপানোর যন্ত্র সুরাটে বসাতে যায় তখন তাদের বাধা দেওয়া হয়ে এই বলে যে যারা বই নকল করছে তারা বেকার হয়ে যাবে। ১৬৭৩ সালে ওলন্দাজরা করমণ্ডলে এমন যন্ত্র বসায় যে লোহার পেরেক ও কামানের গোলার উৎপাদন চারগুণ হয়ে যাবে। স্থানীয় শাসকরা এটা বন্ধ করে দেয় কারণ লৌহকাররা বেকার হয়ে যাবে। তপন রায়চৌধুরী বলেছেন অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইউরোপ ভারতের থেকে বহু বিষয়ে এগিয়ে ছিল যার মধ্যে ফেলা যায় জল ও বাতাস থেকে শক্তি আহরণ, ধাতুবিদ্যা, ছাপাখানা, নৌচালনার যন্ত্র ও সাধারণ বহু যন্ত্র।

এটা ঠিক নয় যে ভারতীয় কারিগররা নূতন যন্ত্র ব্যবহার করতে অস্বীকার করত বা অদক্ষ ছিল। সুরাটে যে জাহাজ তৈরি হত সেগুলি ইউরোপীয় জাহাজের থেকে কোন অংশে কমজোরী নয়, শুধু জাহাজে কামান ব্যবহার করা ছাড়া যেটার উন্নতি নানা কারণে হয়নি বলে ইউরোপীয় পর্যটক ও বণিকরা মনে করেছেন। ভারী কামানও তৈরি হত। কাঁচা রেশম উৎপাদন করা, নীল ও সোরা তৈরি করা ইউরোপীয়দের অনুকরণে করতে ভারতীয় কারিগরদের বাধেনি। তাদের ভয় ছিল শুধু যে তারা কর্মহীন হয়ে পড়বে এবং দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে যেটা তারা করতে চাইত না।

আগে আমরা দেখেছি যে শহরের বিভিন্ন মহল্লায় পেশাগতভাবে কারিগররা বসবাস করছে, যার সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে ইউরোপীয় শহরের কারিগর ও শিল্পের ভীড় তুলনা করা যায়। কিন্তু মধ্যযুগের ভারতের ছবিটা একটা আলাদা। এখানে গ্রামে কয়েকটা শিল্প রয়েছে যেমন চিনি, তেল, নীল, কাঁচা রেশম ইত্যাদি যেগুলি অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চলেছিল। এর ফলে কয়েকটা জায়গায় উৎপাদনের স্থানীয় কেন্দ্র গড়ে ওঠে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইংরাজ লেখক রবার্ট ওরমে বলেছেন যে বাংলার তখন কোন গ্রাম নেই যেখানকার অধিবাসীরা কাপড় উৎপাদন করে জীবিকানির্বাহ করে না। মাদ্রাজ উপকূল থেকে বহুদূর পর্যন্ত কাপড়ের কারিগরদের গ্রাম ছিল যারা সাধারণত রপ্তানীর জন্য উৎপাদন করত। ঢাকা শহরের নদীর ধার ধরে প্রায় দু'মাইল বরাবর নৌকা সারানো ও নির্মাণের কারিগররা বাস করত।

তাঁতীরা অধিকাংশই পরিবারভিত্তিক কাজ করত। মহিলা ও বাচ্চারা তুলো পরিষ্কার করত, যদিও ধুনুরী তখন এসেছে, এবং অনেকক্ষেত্রেই সুতো তৈরি করত। পুরুষরা প্রধানত তাঁত চালাত এবং বিক্রির ব্যবস্থা করত, যদি আগে চুক্তি না করে থাকে। তাঁত নিজেদের থাকলেও অধিকাংশ তাঁতীর তুলো কেনার মত অর্থ ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে চন্দননগরের ফরাসী ডিরেক্টার দালাল প্রথা বন্ধ করার জন্য সরাসরি তাঁতীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে পারেন যে আগাম না দিলে তাদের পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়।

সরকারি কারখানাতে এবং তাদের অনুসরণ করে বড় বড় অভিজাতদের কারখানায় কারিগররা বাইরে থেকে এসে এক ছাদের তলায় কাজ করত যে কথা বার্নিয়ার সরকারি

Scanned with CamScanner

কারখানা সম্বন্ধে বলেছেন। এদের সংখ্যা কত ছিল জানা যায় না। তবে হীরকের খনিতে কনট্রাক্টরের অধীনে দু-তিন হাজার কারিগর কাজ করত এটা জানা যায়। হীরক খনির সব কারিগরদের সংখ্যা ধরলে প্রায় ত্রিশ হাজারের কাছে হবে। এছাড়া বড় প্রাসাদ বা জাহাজ বানাতে এই ধরনের বহু কারিগরকে এক জায়গায় জড় করা হত। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম-দিকের লেখা *বাহারিস্তানে* এই ধরনের কাজের জন্য সর্দারদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে একথা বারবার বলা হয়েছে। কিন্তু এগুলি সবই ছিল বিশেষ কাজের জন্য, স্থায়ী কোন সংস্থা নয়।

গ্রামাঞ্চলের কারিগররা ছিল অর্ধ-সময়ের কারিগর। চিনি তৈরি করা, নীল, তেল ইত্যাদির ক্ষেত্রে একটা সময় যখন কোন কাজ থাকত না তখন তারা জমিতে চাষ করত বা অন্যদেরকে চাষের জন্য জমি ভাড়া দিত। জমি ও মানুষের হার মানুষের দিকে থাকায়, এই ধরনের অর্ধ সময়ের কারিগরদের কিছু জমিও ছিল। তাছাড়া গ্রামের অধিবাসীদের কাজ করে দেবার বদলে তারা গ্রামের ফসলের কিছু অংশ পেত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষেও মহীশূরে যে এই প্রথা চলছিল টিপু সুলতানের সময়ে তার নথী পাওয়া যায়। অর্থাৎ এখানে কারিগর গ্রাম্য জগতের সঙ্গে মিশে রয়েছে, বাজারী অর্থনীতির সঙ্গে তার যোগ কম।

শহর ও শহরাঞ্চল গড়ে ওঠার সঙ্গে পেশাগত কারিগরদের সংখ্যা ও গুরুত্ব বাড়তে থাকে যার মূলে অবশ্য রয়েছে উৎপাদন ও বাণিজ্যের প্রসার। বণিকরা এই পেশাগত কারিগরদের অর্থ বা বহুসময় অর্থের সঙ্গে পণ্য আগাম দিয়ে এদেরকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে চেষ্টা করে, যার সঙ্গে মুক্ত বাজারী অর্থনীতির একটা দ্বন্দ্ব রয়েছে। ইউরোপীয় কোম্পানীদের কাপড় কেনার মধ্যে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করার এই প্রচেষ্টা পরিষ্কার দেখা যায়। কারিগরদের বণিকদের মাধ্যমে নমুনা দেওয়া হয়, যার হুবহু অনুকরণ করে উৎপাদন করার উপর জোর দেওয়া হতে থাকে। উৎপাদন ঐরকম না হলে সেগুলি ফেরৎ দিলে বাজারে বিক্রি করতে কারিগর/বণিক বাধ্য হয়। মাদ্রাজ এলাকায় বণিক কাশী ভিরেনা বহু কারিগরকে এইভাবে নিজের নিয়ন্ত্রণে এনে বিশেষ ধরনের উৎপাদন করার ব্যবস্থা করেন যেটা মুক্ত অর্থনীতি থেকে আলাদা। এর ফলে নিজেদের তাঁত থাকা সত্ত্বেও তাঁতীরা মাহিনা নিয়ে কারিগরে পরিণত হয়। অন্যান্য বণিকরা ঐ এলাকাতে মজুরি বাড়িয়ে ১৬৭৩ সাল নাগাদ আরো ভালো উৎপাদন করার ব্যবস্থা করতে থাকে। কিন্তু একে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি বলা যাবে না, কারণ এর ফলে পুরানো প্রথা উঠে যায়নি। তার থেকেও বড় কথা যে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির প্রসারের এটি প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

আবুল ফজলের লেখা থেকে ওস্তাদ-কারিগরদের কথা পাওয়া যায় যাদের উনি অভিজাতদের নীচে রেখেছেন কিন্তু পণ্ডিত ও ধার্মিক লোকেদের উপরে রেখেছেন। এদের অধীনে বহু শিক্ষানবীশ কারিগর থাকত এবং এদের উৎপাদন বাজারে বিক্রি হত। এরা প্রধানত নিজেদের খরচে তাঁত বসিয়ে কারিগর রেখে নিজেদের অর্থে সুতো কিনে বাজারে বিক্রি করত। অযোধ্যায় এরকম এক ওস্তাদ কারিগরের কথা পাওয়া যায় প্রধানত ছাপা

Scanned with CamScanner

কাপড় তৈরি করে বাজারে বিক্রি করতে যার অধীনে থাকত প্রায় পাঁচশো কারিগর। কাশ্মীরে শাল শিল্পে এরকম ওস্তাদ-কারিগরের কথা পাওয়া যায় যার কাছে তিনশো তাঁত ছিল। তপন রায়চৌধুরী বাংলাতে এই ধরনের ওস্তাদ কারিগরদের কথা পেয়েছেন যারা বণিকের পুঁজিকে শিল্পের পুঁজিতে বদল করে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি নিয়ে আসছে। সতীশ চন্দ্রও মুঘল যুগে যে এই ধারা চলছিল তার উল্লেখ করেছেন।

মহিলাদের অবস্থা

মধ্যযুগে পুরুষশাসিত সমাজে মহিলারা পিতা, স্বামী বা পুত্রের উপর নির্ভরশীল হয়েছিলেন। উচ্চবর্গের মহিলারা শিক্ষিত হলেও বাড়ির বাইরে যেতে পারতেন না এবং হারেমের মধ্যে স্বামীর অন্যান্য পত্নী ও উপপত্নীদের সঙ্গে কাল কাটাতেন। গুলবদন বেগমের লেখা *হুমায়ুন-নামাতে* এই জীবনের কিছু অংশ পাওয়া যায়। তবে অনেক ক্ষেত্রেই মহিলারা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে রাজ্য শাসন করেছেন, যুদ্ধও করেছেন যদিও ঐ ধরনের দৃষ্টান্ত বিশেষ কম। গণ্ডোয়ানার রাণী দুর্গাবতী ও আহমদনগরের চাঁদবিবির কার্যকলাপ আমরা আগে দেখেছি। জাহাঙ্গীরের সময়ে নূরজাহানের কার্যকলাপও আমাদের জানা। নূরজাহান শিল্পকীর্তির অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। পরবর্তীকালে শাহজাহানের মেয়ে জাহানারা বেগম পর্দার আড়াল থেকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এরা পণ্ডিতদের, শিল্পীদের নানাভাবে উৎসাহ দিয়েছিলেন যেটা রোশেনারার বিখ্যাত বই-এর কারখানা স্থাপনের মধ্য দিয়ে দেখা যায়। তাছাড়া এরা বিভিন্ন পথঘাট, সাঁকো, মসজিদ, সরাইখানা ইত্যাদি জনহিতকর কাজে প্রচুর অর্থ ও সময় ব্যয় করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা ইংরাজদের আগ্রাসী ভূমিকার মুখে মহিলারা যে জমিদারী পরিচালনা করেছিলেন এবং বহু জমিদারী ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন, সেটা আমরা বাংলার ইতিহাসে লক্ষ্য করেছি। একই সঙ্গে এদের দান-ধ্যান ও জনহিতকর কাজ বাংলার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে।

আমরা আগেই দেখেছি যে স্ত্রীধীন ছাড়া মহিলাদের সম্পত্তির অংশ পাবার সম্ভাবনা খুবই কম ছিল। কিন্তু সেটা ছাড়িয়ে উঠেছিল কতকগুলি সামাজিক প্রথা যেগুলি সামাজিক কুসংস্কারের ফল। অল্পবয়সে বিবাহ দেওয়া বা বড় হলেও জোর করে বিবাহ দেওয়ার রেওয়াজ সমাজে বিশেষভাবে চালু ছিল। আকবর আইন করে ছেলেদের ও মেয়েদের বিবাহযোগ্য নূন্যতম বয়স ঠিক করে দিয়েছিলেন। মেয়েরা যে নিজেদের পছন্দমত বিবাহ করতে পারবে সে কথাও বলেছিলেন। কিন্তু তাঁর ঐ আইন সমাজে বিশেষ সমাদর পায়নি। উনি সতীদাহ প্রথা কমানোর জন্য আইন করেছিলেন যে মেয়ের মত না থাকলে এটা করা যাবে না। এই আইনও বিশেষ কাজে লাগেনি। বার্নিয়ার ও অন্যান্য ইউরোপীয় পর্যটকরা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে কিভাবে জোর করে সতীদাহ করা হচ্ছে যার থেকে বার্নিয়ার একজনকে উদ্ধার করেছিলেন। অবশ্য দু-একজন পর্যটক বলেছেন যে বাড়ির সম্মান ও মৃত স্বামীর

Scanned with CamScanner

সম্মান বাঁচানোর জন্য মেয়েরা সতী হতে রাজী হত। ১৬১৪ সালে মহারাজা মান সিংহ কাছোয়া এলিচপুরে মারা গেলে, চারজন রাণী ওখানেই সতী হন এবং আরো পাঁচজন অম্বরে (জয়পুরে) সতী হয়। রাজপুত রাজারা যে আকবরের এই আইন মানেনি তার বহু দৃষ্টান্ত ওদের দুর্গের মধ্যে পাথরে রাখা আছে। তবে এই সতী করাতে জোরজবরদস্তির হয়ত প্রয়োজন হত না এবং সবাই সতী হতেন না। সমকালীন রাজস্থানী নথী থেকে দেখা যায় যে বহু জায়গাতে বিধবা রাণীরা বাস করছেন। রাজপুত রাজপরিবারের কাছে সতী একটা সম্মানের ও মর্যাদার প্রশ্ন যেখানে আকবরী আইনের কোন স্থান নেই।

বিবাহ বিচ্ছেদ মুসলিম সমাজে আইনী হলেও মুসলিম অভিজাতরা পছন্দ করতেন না। এর মাত্র কয়েকটি উদাহরণ পাওয়া যায়। মুসলিম অভিজাতের মৃত্যুর পরে সরকার তার সম্পত্তি নিয়ে নিত এবং সম্রাট তাঁর পছন্দমত মৃতের ছেলেদের মধ্যে বিতরণ করতেন। অভিজাতদের মেয়েদের সম্পত্তি দেওয়া হচ্ছে এরকম কোন উদাহরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু বিচারালয়ে অন্যান্য মুসলিমদের ক্ষেত্রে মেয়েদের সম্পত্তির অংশ দেবার আইনী ব্যবস্থা ছিল।

নীচু শ্রেণীর মেয়েরা বাইরে কাজ করত। তাদের জীবন যে সুখের ছিল না এটা সহজেই বোঝা যায়। এরা মাঠে কাজ করত, বড় বড় প্রাসাদ বানানোর মধ্যে ছিল যা আমরা সমকালীন মুঘল চিত্রকলায় দেখি। ওদের মজুরি ছিল পুরুষদের তুলনায় কম। হারেমে রক্ষীবাহিনীর ও অন্যান্য কাজ করত, যদিও তারা অ-ভারতীয় মহিলা বলে বোধ হয়। বাংলাতে আমরা দেখেছি যে মেয়েরা সুতো কাটছে। মসলিনের সূক্ষ্ম সুতো কাটার কাজ মেয়েরা করত এবং সেক্ষেত্রে মজুরী ছিল পুরুষদের সমান—মাসে তিন টাকা। আরো কতকগুলি বাইরের কাজের কথা অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের লেখক ভারতচন্দ্রের বর্ণনা থেকে পাওয়া যায়। এর মধ্যে পড়ে ঘাট-পারাপারের নৌকা চালানো, বাজারে ফুল বিক্রি করা, অন্যের বাড়িতে ঘরের কাজ করা ইত্যাদি। অযোধ্যায় বিখ্যাত চিকনের কাজ ওখানকার মেয়েরা করত। কিন্তু এটা ঠিকই যে এই সব মেয়েরা কোন বণিকের তত্ত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে কাজ করত। সম্রাটের হারেমের দারোগা ছিলেন একজন পুরুষ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তাঁর ক্ষমতা বাড়তে থাকে যখন সম্রাটের ক্ষমতা কমতে থাকে। এতে অবশ্য হারেমের মহিলাদের কোন উপকার হয়নি।

দাস-দাসী

মুঘল সম্রাট ও অভিজাতরা প্রচুর সংখ্যায় দাস-দাসী রাখতেন তাঁদের পদমর্যাদা দেখানোর জন্য এবং তাঁদের বিশাল বাড়ির কাজকর্ম করার জন্য। ইংরাজ ঐতিহাসিক মোরল্যান্ড মনে করেছেন যে এই পরিমাণ অর্থব্যয় এদের পিছনে কেবল অপব্যয় ছাড়া আর কিছু নয়, যার ফলে আসল কাজ থেকে তারা দূরে সরে যাচ্ছে। কিন্তু আধুনিক সমাজের মাপকাঠি প্রাক্-আধুনিক যুগে চালানো উচিত নয়। এই অসংখ্য দাস-দাসীর কাছে কাজের পথ খোলা ছিল গ্রামে ক্ষেতে মজুর হওয়া বা শহরে কোন পেশা নিয়ে কাজ করা। এদের

Scanned with CamScanner

অধিকাংশই পেশাগত বিদ্যা ও পরম্পরা না থাকায় এ কাজ ওদের পক্ষে করা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া সম্রাট অভিজাতদের বাড়িতে কাজ করলে সময়ে সময়ে উন্নত জীবনযাত্রা তাদের সামনে আসত।

ভারতে দাসপ্রথা বহুদিনের পুরানো। সাধারণত ভারতে দাসেরা উৎপাদনের মধ্যে ছিল না যদিও অভিজাতদের ছোটখাট বাগানে তরকারী বা অন্য কিছু ফলানোর কাজ করতে হত। সুলতান ফিরোজ তুঘলক প্রচুর সংখ্যায় দাস সংগ্রহ করে ওদের উৎপাদনের কাজে লাগিয়েছিলেন। আফগানদের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে দাসদের দিয়ে যুদ্ধ করানোর প্রথা বন্ধ হয়ে যায়। আকবর ওদেরকে সৈন্যদের পরিষেবার জন্য ব্যবহার করেছিলেন।

মুঘল যুগে দাস-দাসীদের মূল্যের কথা বিশেষ পাওয়া যায় না। পিরাদ দ্য লাভাল গোয়াতে একটি দাসীর মূল্য ধরেছেন পঞ্চাশ টাকা। শুধু পর্তুগিজ নয়, ইংরাজ, ওলন্দাজ ও ফরাসীরা নিজেদের শহরে প্রচুর সংখ্যায় দাস-দাসী ব্যবহার করেছে। কলকাতা, চন্দননগর ও চুঁচূড়াতে দাস বিক্রি হত। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে পর্তুগিজ জলদস্যু ও আরাকানীরা (মগ বলা হত) সম্মিলিতভাবে পূর্ববাংলার উপকূলে অভিযান চালিয়ে দাস-দাসী সংগ্রহ করে চট্টগ্রাম, সন্দীপ, হুগলী ও পিপলীর দাস বাজারে বিক্রি করত। ১৬৬৬ সালে মুঘলরা চট্টগ্রাম অধিকার করে নিলেও উপকূলে এমনকি ঢাকা পর্যন্ত এই ধরনের অভিযানে ইংরাজরা ব্যতিব্যস্ত হয়েছিল। চন্দননগরে ফরাসীরা দাস বিক্রির উপর কর বসায় এবং চন্দননগর থেকে জাহাজে দাস-দাসী পাঠানো বন্ধ করে দেয়। ১৭৩০ সালের দশক থেকে ফরাসীরা বুরবোঁ দ্বীপে দাসেদের সাহায্য কৃষি উৎপাদন শুরু করলে ভারত থেকে তারা নিয়ন্ত্রিত সংখ্যায় দাস পাঠাতে থাকে। চন্দননগরে দাস দেওয়া হত যেকোন ঋণের মতই শর্ত সাপেক্ষে, বন্ধক রেখে টাকা নেওয়া হত। বিবাহের সময়ে দান করা হত। পাদ্রীরাও দাস-দাসী রাখতেন। মৃত্যুর সময়ে অনেক ফরাসী দাস-দাসীদের হয় মুক্ত করে দিয়েছে, নয়ত সম্পত্তির অংশ দিয়ে দিয়েছে। আগে এদের খ্রিস্টান করা হত। তবে অনেকেই ছিল মিশ্র ইঙ্গ-পর্তুগিজ ও খ্রিস্টান।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ফরাসী পর্যটক মোদাভ দিল্লিতে ছিলেন। ওখানে দাসীদের বিক্রির বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। অধিকাংশই মহিলা দিল্লির অধিবাসী, কিন্তু কাশ্মীর, মুলতান ও কাবুলের মহিলারাও রয়েছে। দিল্লিতে দোকানঘর রয়েছে যেখানে মেয়েদের রাখা হয় ও যেখান থেকে ক্রেতারা পছন্দ করে। বিক্রেতারা সাধারণত দালাল যারা বিক্রির পর মালিকের সঙ্গে হিসাব করে নেয়। বিক্রি করা ছাড়াও মাসিক ভাড়া দেওয়া হয়। বিক্রির পর মালিককে বিক্রিত মহিলা ও ক্রেতাকে নিয়ে কোতোয়ালীতে যেতে হয় যেখানে বিক্রির শর্ত নথীভুক্ত করা হয়। এরপর বিক্রি সম্পূর্ণ হচ্ছে বলে বলা যায়। সাধারণত যেভাবে ঘোড়া কেনাবেচা করা হয়, এখানেও সেই একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। ইউরোপীয়রাও এইভাবে কেনার মধ্যে রয়েছে।

বিভিন্ন সূত্রে দাস-দাসী সংগ্রহ করা হত। বিদেশের মধ্যে পূর্ব আফ্রিকা থেকে অল্প-সংখ্যক দাস-দাসী নিয়মিত আসত। লোহিত সাগর থেকে ফিরতি জাহাজে এদের আনা

Scanned with CamScanner

হত। মোখা ও জেড্ডা ছিল দাস ব্যবসায়ের কেন্দ্র। ভারতীয় দাস-দাসী পাওয়া যেত যুদ্ধের বন্দীদের মধ্যে থেকে ও বিদ্রোহীদের গ্রাম লুট করে। দুর্ভিক্ষের সময় বাবা-মা তাদের সন্তানদের বিক্রি করছে এঘটনা প্রায়ই ঘটত। আকবর যুদ্ধবন্দীদের দাস করার বিরুদ্ধে ছিলেন বা তাদের মুসলমান করারও বিরুদ্ধে ছিলেন। যেসব দাসদের কেনা হয়েছে তারা আবার যেন ফেরৎ যেতে পারে তার আদেশও দিয়েছিলেন। আকবরের বহু সামাজিক সংস্কারের মত এই সব নির্দেশ কতটা কার্যকরী হয়েছিল এ নিয়ে সন্দেহ আছে। সাধারণত ভারতে দাস-দাসীদের উপর অত্যাচার করা হত না, যেটা দেখার জন্য সরকার থেকে এক আমলাকে রাখা হয়েছিল। খ্রিস্টানরা ছাড়াও বহু মুসলমান অভিজাত তাদের দাস-দাসীকে মুক্তি দিয়ে গিয়েছে নৈতিক কাজ হিসেবে। সারা অষ্টাদশ শতাব্দী ধরেই দাস প্রথা চলতে থাকে। সমকালীন ইউরোপীয়দের একাংশের মত মোদাভ কঠোর ভাষায় দাস প্রথা, দাস ব্যবসার সমালোচনা করেছেন এবং এতে যে মানুষের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় সে কথা বলতে ভোলেন নি।

জীবনযাত্রার মান

সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের পর্যটক বার্নিয়ার বলছেন যে মুঘল ভারতে মাত্র দুটি শ্রেণী আছে—উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণী। এর মধ্যে কোন মধ্যবিত্ত শ্রেণী নেই, যে মতবাদ মোরল্যান্ড স্বীকার করে নিয়েছেন কেবল বাংলার ক্ষেত্র ছাড়া। উচ্চ ও নীচু শ্রেণীর মধ্যে জীবনযাত্রার মানের বিশাল ফারাক রয়েছে। উচ্চ শ্রেণী বড় বড় প্রাসাদে, দাস-দাসী, লোক-লস্কর নিয়ে বাস করে। পথে যখন বেরোয় তখন অগণিত অনুচর চলে সামনের রাস্তা পরিষ্কার করতে করতে। নীচু শ্রেণীর লোকেরা কুঁড়ে ঘরে বাস করে, যেগুলি মাঝে মাঝে আগুন লেগে পুড়ে যায় ও তাদের পর্ণকুটিরে কোন আসবাব নেই। ধাতুর বাসনপত্রও বিরল। এই নীচু শ্রেণীর লোকেরা অধিকাংশই কৃষক, গ্রামাঞ্চলের ভূমিহীন মজুর ও শহরের কারিগর ও শ্রমিক যারা প্রায় অর্ধাহারে দিন কাটায়। গ্রামাঞ্চলের সমাজ যে পরিষ্কার দুটি শ্রেণীতে ভাগ হয়েছিল সেটা আমরা আগে দেখেছি যদিও জমি প্রচুর পড়ে ছিল। কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর কাছে এই অনাবাদী জমি কোন কাজের নয়, কারণ চাষ করতে গেলে যে গবাদি পশু, লাঙল, বীজ ইত্যাদি লাগবে সেগুলি তাদের নেই।

সাম্প্রতিক গবেষণার দেখা যাচ্ছে যে বার্নিয়ারের বক্তব্য একটু বেশি সরলীকরণ। শহরে ও গ্রামে কিছু লোকের উদ্ভব হচ্ছে যাদের অবস্থা ছিল স্বচ্ছল। গ্রামে এই ধরনের কিছু লোক ছিল এবং তারা ঋণ নিয়ে অনাবাদী জমিতে বসে যাচ্ছে সেটা আমরা দেখেছি। এছাড়া গ্রামে ও শহরে ওস্তাদ-কারিগরের আবির্ভাব হয়েছে যাদের হাতে লগ্নী করার মত অর্থ রয়েছে। গ্রামে জমিদাররা কম হারে কর দিত। রাজস্থান ও উড়িষ্যাতে উচ্চবর্গের লোক—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা বা রাজপুতরা আনুমানিক শতকরা ২৫ ভাগ কর দিত যেখানে অন্যরা দিত শতকরা ৪০ ভাগ। গ্রামের আমলারা—যেমন মুকদ্দম, চৌধুরী ইত্যাদিও কম

Scanned with CamScanner

হারে কর দিত। সুতরাং সম্পন্ন ও স্বচ্ছল চাষীর অভাব ছিল না। শহরে ছোট আমলারা ও বণিকদের সহজেই মধ্যবর্তী শ্রেণীর মধ্যে ফেলা যায়। ঐ ধরনের কোন কোন ছোট আমলা প্রচুর অর্থ করেছিলেন তার প্রমাণ আছে। বাংলাতে কায়স্থরা যে এই ধরনের রাজকার্য করে প্রচুর জমিজমা করেছিলেন তার বহু প্রমাণ আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই ধরনের লোকেদের, যাদের মধ্যে ব্রাহ্মণও ছিল, জমিদার হতে দেখা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অনেক সাধারণ লোক ইংরাজদের দাক্ষিণ্যে বড়লোক হয়েছে এ প্রায়ই দেখা যায়। বলা যায় যে ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষ থেকেই মধ্যবর্তী শ্রেণীর উদ্ভব শুরু হয়ে গিয়েছিল।

গ্রামে জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে বিশেষ তথ্য নেই। গ্রামের লোকেদের আয়ের মধ্যে, যা আসছে প্রধানত জমি থেকে, যথেষ্ট তারতম্য ছিল বলে আগে আমরা দেখেছি। বিভিন্ন ধরনের লোকেরা উৎপাদনের কত অংশ দিচ্ছে এটা জানা শক্ত। কারা কতটা করের ছাড় দিচ্ছে সেটুকু বলা যায়। একটা গ্রামে সব কৃষক ও কারিগরের একই ধরনের ও মানের জীবনযাত্রা ছিল সেটা ভাবা ঠিক নয়। এক গ্রাম আবার আর একটা গ্রামের মত একই ধরনের ছিল মনে হয় না। বড় বড় গ্রামে শস্য জমানোর কেন্দ্র ও মাণ্ডি ছিল। একদল স্বচ্ছল চাষী ও শস্য বিক্রেতারা মহাজন ও পোদ্দারের সঙ্গে গ্রামে থাকত যা আমরা ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষদিকে লেখক মুকুন্দরামের লেখায় পাই। দামুন্যা গ্রামে, যার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গিয়েছে, পোদ্দার ছাড়া ছিল গ্রামের মোড়ল গোপীনাথ নন্দি ও ডিহিদার মাহমুদ শরীফ।

বাবর বলেছেন যে ভারতে কৃষক ও নীচু আয়ের লোকেরা কোমরে একটা কাপড় জড়িয়ে থাকত ও মেয়েরা শাড়ি পড়ত। আবুল ফজল বলেছেন যে সাধারণ লোকেরা শুধু লুঙ্গি পরে। আকবেরর সময়ের পর্যটকও শুধু কোমরে কাপড় জড়ানোর কথা বলেছেন। কিন্তু তারা শীতকালে টুপী ও আলখাল্লা জাতীয় জামা পড়ে। এই কম কাপড় পড়া সম্ভবত আসছে অত্যন্ত উষ্ণ আবহাওয়ার জন্য, কিন্তু এটাও দারিদ্র্যের একটা অঙ্গ হিসাবে ধরা প্রয়োজন। উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা যে অত্যন্ত দামী ও বেশি জামাকাপড় পড়ত সেটা মুঘল চিত্রকলা থেকে যেমন বোঝা যায়, তেমনি পর্যটকদের লেখাতেও পাওয়া যায়। এটা মনে রাখতে হবে যে ঐ সময়ে তাঁতের কাপড়ের উৎপাদনের স্বর্ণযুগ হলেও এবং সারা দেশে ঐ উৎপাদন হলেও কাপড়ের দাম ছিল গমের থেকে বেশি।

মোরল্যান্ড বলেছেন যে মেয়েরা শাড়ির সঙ্গে কোন জামা পরত না। কারণ তারা ছিল খুব গরীব। এটাকে সব জায়গায় সত্য বলে মানা যায় না কারণ সমকালীন হিন্দি কবি সুরদাস আগ্রা অঞ্চলের গোয়ালিনীদের নানান রং-এর *চোলি* ও *আঙ্গিরার* বর্ণনা দিয়েছেন। সাধারণত উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলিতে জামা পড়ার রেওয়াজ ছিল। কিন্তু মালাবারে ঊনবিংশ শতাব্দীতে পুরুষ ও মহিলারা কোমরের উপরে আর কোন কাপড় রাখতেন না। যেটা নিয়ে কোন বিতর্ক নেই সেটা হল মহিলাদের অলঙ্কার পরার প্রথা যা ছিল সোনা, রুপো ও তামার। পর্যটক ফিচ পাটনাতে মহিলারা রুপোর ও তামার গয়না পড়ছে, এমনকি পায়ে পর্যন্ত, তার বর্ণনা দিয়েছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে জেসুইট পাদ্রীরা

Scanned with CamScanner

পূর্ববাংলাতে মেয়েদের প্রচুর গয়না পড়ার কথা বলেছেন। বড়লোক ছাড়া জুতো পরার রেওয়াজ ছিল না, যদিও মুঘল চিত্রকলায় মেষ পরিচালক, রাজমিস্ত্রী ও মজুরদের জুতো পরা দেখা যায়।

মুঘল যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলের গরীবদের বাসার চেহারায় বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। কুঁড়েঘরে একটা ঘর নিয়ে পরিবার থাকত। দক্ষিণ দিকের কুঁড়েগুলি এত নীচু ছিল যে ঘরের মধ্যে কেউ মাথা সোজা করে দাঁড়াতে পারত না। ঘরের মধ্যে কোন জানালা নেই। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে জেসুইট পাদ্রীরা বলেছেন সোনারগাঁওতে দরজা লাগানো হয়েছে বাঘ ও শিয়ালদের ঠেকানোর জন্য। পাদ্রী মানরিক অবশ্য বলেছেন যে ঘরের মেঝে ও দেওয়াল খুব পরিষ্কার রাখা ছিল গোবর ও প্লাস্টার দিয়ে ক্রমাগত ঘসার ফলে। কিন্তু গুজরাটে খড়ের ছাদের বদলে টালী ব্যবহার করা হত এবং বহু জায়াগাতেই ইঁট ও চুনের বাড়ি ছিল।

ধাতুর দাম বেশি থাকায় গরীবরা সাধারণত ধাতুর বাসন ব্যবহার করত না। রুটি তৈরি করার জন্য অবশ্য লোহার থালা ব্যবহার করা হত। একমাত্র মাদুর ছাড়া আসবাব বলতে আর কিছুই ছিল না। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ওলন্দাজ পর্যটক গোতিয়ার স্কুটেন বাংলার উপকূলবর্তী এলাকার লোকেরা পর্তুগিজদের মত টেবিল, চেয়ার ব্যবহার করতে দেখেছেন। তবে তারা সম্ভবত বণিক যাদের সঙ্গে বিদেশী বাণিজ্যের যোগাযোগ আছে।

সমকালীন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে সাধারণ লোকেরা ভাত, জোয়ার ও ডাল প্রধান খাদ্য হিসাবে নিয়েছিল। বাংলা, উড়িষ্যা, সিন্ধু, কাশ্মীরও দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভাতই ছিল প্রধান খাদ্য। রাজস্থান ও গুজরাটে জোয়ার ও বাজরা ছিল প্রধান। সাধারণত কৃষকরা তার পরিবারের জন্য খুব খারাপ ধরনের চাল বা জোয়ার রেখে দিত। আগ্রা-দিল্লি অঞ্চলে যেখানে গম ছিল প্রধান ফসল, সেখানে সাধারণ লোকেরা গম খেত কিনা সন্দেহ আছে। মালবে যেখান থেকে রাজপরিবারের খাবারের জন্য গম চালান যেত, সেখানে পর্যটক টেরী দেখেছেন যে ময়দার সঙ্গে খুব খারাপ ধরনের শস্য মিশিয়ে মোটা চাপাটি তৈরি করছে সাধারণ লোকেরা নিজেদের খাবার জন্য। বাংলা, উড়িষ্যা ও উপকূলবর্তী এলাকাতে সাধারণ লোকেরাও মাছ খেত। তবে নানান ধরনের তরকারী পাওয়া যেত। বৈষ্ণব আন্দোলনের পরে নানা ধরনের তরকারী পাওয়া যেত যা দিয়ে বিভিন্ন রকমের রান্না করা হত। পায়েস এবং অন্যান্য মিষ্টির প্রাচুর্যের কথা বৈষ্ণব ও মঙ্গল কবিতায় পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্রের সামান্য নারী দেবীর কাছে বর চাইছে যেন তার সন্তান 'দুধে-ভাতে থাকে'। সাধারণের কাছে দুধ ও চিনির অপ্রতুলতা ছিল না বলে বোধ হয়। বাংলাতে প্রচুর পরিমাণে চিনি উৎপাদন হত এবং মাঠ ও জঙ্গল প্রচুর থাকায় গোচারণ ক্ষেত্র ও জ্বালানী কাঠের অভাব ছিল না। তবে বিভিন্ন ধরনের শাকের কথা পাওয়া যায় যা ছিল সাধারণ খাদ্য তালিকার অপরিহার্য অঙ্গ। দিল্লি-আগ্রা এলাকাতে জাহাঙ্গীরের সময়ের পর্যটক পেলসার্ট দেখেছেন যে শ্রমিক বা মজুররা সাধারণত দিনের

Scanned with CamScanner

বেলায় ছোলা চিবাচ্ছে বা ছাতু খাচ্ছে। সন্ধ্যায় বাড়ি এসে তারা খিচুড়ী খায় একটু মাখন দিয়ে।

মেলা, উৎসব, পার্বণ যা প্রায়ই হত, জীবনের একটা অন্যদিক এনে দিত সাধারণ লোকেদের এবং তার জন্য তারা কিছু অর্থও খরচ করত। সাধারণত গ্রামে তৈরি হয় না এমন জিনিষই কেনা হত। এই সব উৎসবের বড় ফল ছিল যে আশেপাশের বহু গ্রামের কারিগরদের উদ্বৃত্ত পণ্য বিক্রি করার সুবিধা করে দেওয়া। পণ্য বিক্রি ছাড়াও ছিল সাংস্কৃতিক উৎসব যেখানে কথকতা, গান ইত্যাদি হত। ব্যক্তিগত উৎসব যেমন বিবাহ বা শ্রাদ্ধে অর্থ খরচ হত যার জন্য অনেক সময়ে ঋণ নিতে হত। অনাবৃষ্টি, আকাল ও দুর্ভিক্ষ ছিল ভয়ংকর যার ফলে সমস্ত গ্রাম হয় ছেড়ে চলে যেত, না হয় উজাড় হয়ে যেত। মুঘল যুগে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কথা পাওয়া যায়। ১৬৭০ সালের পাটনা ও উত্তরবঙ্গ জুড়ে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে বহু লোক মারা যায়। ১৬৩০-৩২ সালের গুজরাটে এই ধরনের দুর্ভিক্ষে গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে গেলে কাপড়ের উৎপাদন বিশেষভাবে ব্যহত হয়। কিন্তু অনাবৃষ্টির দরুন ছোটখাট দুর্ভিক্ষ এই বিশাল সাম্রাজ্যের কোথাও না কোথাও লেগে ছিল। মুঘল সরকার এসব এলাকার রাজস্ব অব্যাহতি দিয়ে লঙ্গরখানা থেকে বিনামূল্যে খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা করেন, যে ধরনের ব্যবস্থা ১৭৭০ সালে বাংলাতে দুর্ভিক্ষের পর ইংরাজরা করেনি।

শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান বোঝা খুব কঠিন নয় কারণ আবুল ফজল ওদের মজুরীর তালিকা দিয়েছেন। উনি বলছেন যে একজন অদক্ষ শ্রমিক দিনে দু *দাম* (মাসে দেড় টাকা) এবং এক দক্ষ শ্রমিক সাধারণত দিনে চার *দাম* (মাসে প্রায় তিন টাকা) পায়। ছুতোররা দিনে তিন থেকে সাত *দাম* ও রাজমিস্ত্রীরা দিনে পাঁচ থেকে সাত *দাম* পায়। এক ইউরোপীয় পর্যটকের মতে একজন চাকর মাসে তিন টাকা পায়। একটা হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে একজনের মাসে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজন ছিল মাসে এক টাকা এবং পাঁচ জনের এক পরিবারের জন্য লাগত মাসে দু টাকা। পেলসার্ট বলছেন যে পাল্কীর কাহাররা কাছাকাছি যাবার জন্য মাসে পেত চার টাকা, কিন্তু দুমাসের উপরে যাত্রা করলে মাসে পাঁচ টাকা পেত। সৈন্যদেরও রক্ষী হিসাবে ভাড়া করলেও মাসে পাঁচ টাকা লাগত।

মুঘল যুগের কৃষকরা কতকগুলি খাবার সস্তায় পেত। ঘি পাওয়া তাদের পক্ষে সহজ ছিল কিন্তু নুনের দাম ছিল বেশি। আলু এসেছে পরে। অর্থনীতিবিদ অশোক দেশাই বলছেন যে মুঘল যুগে এক একজনের হাতে জমি ছিল বেশি এবং সে বেশি খাবার পেত বর্তমানকালের তুলনায়। আগেই আমরা দেখেছি যে সাধারণের কাছে দুধ, ভাত ও সবজি সহজলভ্য ছিল। আকবরের পর থেকে মূল্যমান বাড়তে থাকে এবং মজুরী অতটা না বাড়লেও কিছুটা বাড়ে। ঐ মজুরী থেকে দেখা যায় যে শ্রমিক গম কিনতে পারত যদিও তার খাদ্য তালিকাতে সেটি ছিল না। অশোক দেশাই-এর মতে, যেটা সতীশ চন্দ্র মেনে নিয়েছেন, যে আকবরের সময়ে অদক্ষ শ্রমিকের খাদ্যের মধ্যে ছিল পাঁঠার মাংস (মুসলিমদের পক্ষে প্রযোজ্য), ঘি, দুধ, চিনি, গুড় ইত্যাদি। সুতরাং জীবনধারণ করা সম্ভব হয়েছিল।

Scanned with CamScanner